শক্তিরূপিণী কালী : তত্ত্বে ও মাহাত্ম্যে

ড. শ্যামপদ মণ্ডল

কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা বা কালী। কালকে যিনি গ্রাস বা হরণ করেন তিনি কালী। তিনি ধ্বংসের দেবী, তিনি সৃষ্টিরও দেবী। কালো তো ভালো, কালো জগতের আলো। কালো থেকেই আসে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী আলো। আমরা খোলা চোখে যত দেখি, চোখ বুজে তার থেকে অনেক বেশি দেখি। আলো অপেক্ষা অন্ধকারই বেশি, সেই অন্ধকারের দেবী কালী। এই কালী ও দুর্গাকে আমরা আলাদা করে দেখি, মূলে কিন্তু দুর্গারই এক রূপ কালী, একই মুদ্রার যেন এপিঠ-ওপিঠ।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলেন, জন্ম নিলেন হিমালয় ও মেনকার কন্যারূপে। শ্যামবর্ণা, তাই পিতা-মাতার দেওয়া নাম হল কালী। পর্বতকন্যা, এজন্য ভিন্ননাম পার্বতী। কঠোর সাধনাবলেই স্বামীরূপে শিবকে পেয়েছিলেন পার্বতী। একদা পর্বতচূড়ায় বিহার করার সময় অপ্সরীদের সামনেই গাত্রবর্ণ নিয়ে পার্বতীকে শিব কালো বলে পরিহাস করলে কঠোর তপস্যায় বসলেন পার্বতী। শরীরের কৃষ্ণকোশগুলি ঝেড়ে ফেলে হয়ে উঠলেন গৌরবর্ণা গৌরী। সেই কৃষ্ণকোশগুলির সমষ্টি থেকেই সৃষ্ট হলেন দেবী কৌশিকী। ইনিই কালী বা কালিকা। কোশ থেকে সৃষ্টি, তাই কৌশিকী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী, দেবকুলের সমষ্টিগত শক্তি থেকে চণ্ডিকারূপে আবির্ভূত হয়ে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। স্তবস্তুতিতে তুষ্টা হয়ে দেবকুলকে দেবী বললেন যে, দৈত্য-দানবদের অত্যাচার বাড়লে স্মরণ করলেই তিনি আসবেন। দেবতাদের দিন ভালোই যাচ্ছিল, আবার বিপদ দেখা দিল, শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচার স্বর্গরাজ্য জুড়ে তুঙ্গে উঠল। দেবতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেবী জানালেন, এই অসুরদ্বয়কে বধ করবেন আমারই কৃষ্ণকোশ থেকে সৃষ্ট কৌশিকী। যথা সময়ে দেবী কৌশিকী হিমালয়কন্দরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অনুচরের মুখে শুনে শুম্ভ ও নিশুম্ভ সেই অপূর্ব সুন্দরীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে দেবী বললেন, যে পুরুষ যুদ্ধে আমাকে হারাতে পারবেন তাঁরই কণ্ঠে মালা দেব। রমণীর সঙ্গে যুদ্ধের কথায় রেগে গিয়ে অসুরদ্বয় অনুচর ধূম্রলোচনকে পাঠালেন দেবীকে বলপূর্বক ধরে আনতে। ধূম্রলোচন এগোতেই দেবী তাঁকে হত্যা করলেন। এবার অসুরদ্বয় পাঠালেন সসৈন্য চণ্ড আর মুণ্ডকে। চণ্ড-মুণ্ডকে দেখে দেবীর ক্রোধদীপ্ত কপাল থেকে নরমুণ্ডমালায় শোভিতা, ভীষণবদনা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, খড়্গধারী, শীর্ণদেহা এক ভীষণাদেবী নির্গতা হলেন। সসৈন্য চণ্ড-মুণ্ডকে দেখে ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণা কৌশিকীর কপাল থেকে বহির্গতা এই কালী উক্ত দৈত্যদ্বয়কে বধ করায় নতুন চামুণ্ডা নামে আখ্যায়িতা হলেন। দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা হয়ে থাকে। এইক্ষণে দেবী দুর্গা বধ করেছিলেন চামুণ্ডারূপে মহিষাসুরকে।

চণ্ড-মুণ্ড নিহত হলে দেবীর সঙ্গে সদলবলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন শুম্ভ-নিশুম্ভ। কিন্তু এঁদের একফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়তেই সৃষ্টি হতে থাকে রক্তবীজ নামের রাক্ষস। তখন দেবী চণ্ডিকার নির্দেশে চামুণ্ডাদেবী মাটিতে পড়ার আগেই রক্তবীজের রক্ত খেয়ে ফেলতে লাগলেন। এবার বধ হলেন দুই অসুর। এইভাবে নানা রূপে অসুরবিনাশী মহাশক্তি কালী বন্দিত হন। এভাবেই তিনি মানবের অসুরভাব কাটিয়ে শুভভাবের জাগরণ ঘটান। তিনি আধ্যাত্মিক ভাবধারার দ্যোতক, তিনি মাতা।

চারদিকে কেবল অন্ধকার, তারই মধ্যে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছেন এক নারী। তাঁর পদবিক্ষেপে কেঁপে উঠছে মেদিনী। তাঁর খড়্গের আঘাতে ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিকে যত নরমুণ্ড। হঠাৎ সেই নারীর পা পড়ল শুয়ে থাকা হিমশীতল স্বামী মহাদেবের গায়ে। সে নারী লজ্জায় জিব কাটলেন। এই হল কালীভাবনার লোকশ্রুতি।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের শেষে বঙ্গে তন্ত্র সাধনার প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। এসময় নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র আগমবাগীশ কালীমূর্তির কথা ভাবেন। এর আগে বঙ্গে কালীমূর্তি ছিল না। তান্ত্রিকাচার্য আগমবাগীশ ধ্যানে রাতে দৈববাণী পেলেন, পরদিন সকালে প্রথমে তিনি যে নারীকে দেখবেন, তিনিই হবেন কালীর প্রতিচ্ছবি। কৃষ্ণচন্দ্র পরদিন সকালে পথে বার হয়ে প্রথমেই দেখলেন এক নিম্নশ্রেণীর নারী। সেই নারীর এক পা মাটিতে, অন্য পা বাড়ির পৈঠায়। সেই নারীর এক হাতে গোবরের তাল। এই হাত থেকে গোবর নিয়ে অন্য হাত সবে মাথার ওপরে উঠেছে, গোবরের তাল দেওয়ালে মারার জন্য। এমন মুহূর্তে পেছনে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে আলুথালু মুক্তকেশী সেই নারী লজ্জায় জিভ কাটলেন। এভাবেই তান্ত্রিক আগমবাগীশ পেয়ে গেলেন কালীমূর্তির রূপ। চালু হল কালীর মূর্তি গড়ে পুজো। তবে আমরা কালীর যে নগ্নমূর্তি দেখতে অভ্যস্ত, তা অনেক পরের সংযোজন। হিন্দু সমাজে, বিশেষ করে যাঁরা শাক্ত, তাঁদের মধ্যে কালী আরাধনা প্রধান। তাঁদের কাছে কালীমাতা হলেন আদ্যাশক্তি। তবে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮-১৭৮২) আমল থেকে কালীপুজোর প্রচলন বাড়তে থাকে। ব্রহ্মযামলতন্ত্রে বলা আছে, 'কালিকা বঙ্গদেশে'। অর্থাৎ বঙ্গদেশে কালীপূজা হয়। আদ্যাশক্তিকে সাধনায় সহজভাবে পেতে প্রথমে তাঁর স্থূলমূর্তি দেখার বিধান রয়েছে। স্থূল থেকে সূক্ষ্মমূর্তির ধ্যানে পৌঁছানো যায়। তন্ত্রমতে, কলিকালে কেবল কালীই জাগ্রত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও এই কালীর উপাসক। ইনি মহাবিদ্যা দক্ষিণাকালী। এই কালীর ইচ্ছায় মহাপাপীও সত্বর মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করে।

পুরাণ, উপপুরাণ কিংবা তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিদেবীর বহু রূপ ও বিবর্তন বিস্তার রয়েছে। কালীর অষ্টোত্তর শতনামের কথাও আমরা পেয়ে থাকি। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস' (১৩৮৪) গ্রন্থে বলেছেন, আসলে কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের সর্বত্রই অসংখ্য বিভিন্ন মর্যাদার স্থানীয় মাতৃকাদেবী ছিলেন এবং আজও আছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রিকা শক্তিরূপিণী মহাদেবীর একত্বের ধারণা বিকাশলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান প্রধান আঞ্চলিক দেবীদের

সঙ্গে ওই মহাদেবীর সমীকরণের প্রয়োজন দেখা গেল। একান্ন পীঠের একান্ন জন দেবী (আসলে পীঠ ও দেবীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি) আসলে আঞ্চলিক দেবী, শাক্ত মহাদেবীর সঙ্গে তাঁদের সমীকরণ করার জন্যই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের কাহিনির সঙ্গে সতীর দেহত্যাগ, তাঁর দেহের খণ্ডীকরণ এবং খণ্ডিত অংশগুলির পতন হলে শাক্ত পীঠস্থান গড়ে ওঠার কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়েছে' (পৃ. ২৯১)। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শক্তিদেবীর সহস্র নাম ও রূপের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। তবে, শক্তিদেবীর একান্ন পীঠের মধ্যে এগারোটি পীঠের অবস্থান বীরভূমেই থাকাতে বোঝা যায় কালীসাধনার গুরুত্বপূর্ণ জেলা এটি। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হতে, মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চ ম-কারে জয়ী হয়ে মোক্ষলাভার্থে বহু সাধকই একদা বহু ডোম-হাড়ি-শবর-মুচি কন্যাকে হরণ করেছেন। নরবলির ঘটনাও কম নয়। রাজা বল্লাল সেনও তন্ত্রমতে সিদ্ধ হতে পদ্মিনী নামক ডোমকন্যাকে অপহরণ করেন। অথচ, আদিম বনবাসীরা আদ্যাশক্তি কালীকেই পূজা দিতেন। এই অনার্য কালী কিন্তু ভূষণরহিতা। সারাদিনের শিকার সেরে ব্যাধেরা উপাস্য দেবী চণ্ডীর পীঠস্থানে পশু বলি দিয়ে সেই পশু ভাগ করে গ্রহণ করেছে। চণ্ডীর উপাসক, তাই ব্যাধেরা চণ্ডাল। আর্যরা সবসময় অনার্যদের হীন চোখেই দেখেছে। তাই আর্যদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহাকালী হলেন 'হিংস্র রক্তপায়িনী শর্বরী'। চণ্ডীমঙ্গলের সেই কালকেতুর আমল থেকেই চণ্ডীর রণচণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী—এই দুই রূপ পাই। রণচণ্ডীর চারটি হাত, তিনি ব্যাঘ্রবাহনা, মুক্তকেশী, নগ্না, চারটি হাতই অস্ত্রশোভিত। তিনি শত্রুর হাত থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন। আর মঙ্গলচণ্ডীর দুই হাত, দাঁড়িয়ে পদ্মের উপর, ইনি করুণাময়ী, অভয়দাত্রী।

বিশ্বের কৃষিতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতিতে মাতৃদেবী বা শক্তির আরাধনা থাকলেও, সমীক্ষায় প্রকাশ্য—সে আরাধনার পূর্তি ঘটেছে ভারতেই। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতা ছিল অনার্য সভ্যতা। এই সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে আনুমানিক দু-হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে আগত আর্যদের দ্বারা। আর্যরা কৃষিকাজ জানত না। অনার্যরা তা জানত এবং তারা শক্তিদেবীর পূজায় অভ্যস্তও ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে পাই, দেবকুল একজন মানুষকে বলি দিলেন। মানুষের আত্মা ঘোড়ায় গেল। ঘোড়াকে বলি দেওয়ার ফলে সে আত্মা বৃষে অনুপ্রবিষ্ট হল। বৃষকে বলি দিলে সে আত্মা ভেড়ায় গেল। ভেড়াকে বলি দেওয়ার ফলে ভেড়ার আত্মা ছাগে প্রবেশ করল। ছাগকে বলি দেওয়া হলে ছাগাত্মা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হল। পৃথিবী খনন করে দেবতারা সেই আত্মারূপ যবগম পেলেন। আরম্ভ হল জমি চাষ করে শস্য উৎপাদন। ঋগ্বেদে নারীদেবতা আছে কিন্তু তাঁকে শক্তির দেবী করা হয়নি। এই বেদে অরণ্যকে দেবী ভাবা হয়েছে। পরে অরণ্য নষ্ট করে চাষের উপযোগী ক্ষেত্র করা হলেও তা অনার্য সভ্যতার প্রভাবেই হয়েছে। বনপূজা অনার্যদেরই দান, বনবিবির পালা সে সাক্ষ্যই বহন করে। এই সূত্রেই আসে প্রকৃতি বা অরণ্যপূজার হাত ধরে মাতৃশক্তির পূজা। অস্ট্রিক, মঙ্গল কিংবা দ্রাবিড় সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী ছিল। অবশ্য এই মাতৃ বা শক্তিপূজার রীতি পরে আর্যসমাজে প্রভাব ফেলেছে। আরও পরে তা তন্ত্রে বিস্তার লাভ

করেছে। আসলে মনসা, চণ্ডী, ছিন্নমস্তা, শীতলা, ভূতবিশ্বাস, নবান্ন, হোলি, নবপত্রিকা, চড়ক, ঘেঁটু পূজা, গাজন, কালী, দেবদেবীর বাহন ভাবনা, বৃক্ষপূজা, মৃতের আত্মায় ভক্তি, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি অনার্য সভ্যতারই দান।

শক্তিদেবীর প্রসার ঘটেছে পুরাণসমূহে। দুর্গা কিংবা চণ্ডীদেবী শিকারে দক্ষা। দুর্গাকে রক্ষা করেন যে শক্তিদেবী তিনি দুর্গাশক্তি আর চণ্ডালকে রক্ষা করেন যে মাতৃশক্তি তিনি চণ্ডী বা চণ্ডিকা। দুর্গা ও চণ্ডীকে পরে আমরা গ্রহণ করায় তা হয়ে উঠেছে শিবশক্তির সমতুল্য। দেবী তখন মহাদেবী, তিনিই অদ্বিতীয়া, জীবকুলের রক্ষাকর্ত্রী মহাশক্তি অধিশ্বরী, দেবদেবীর শক্তিদেবী। নিহত হবার কালে দেবীকে নিশুম্ভর প্রশ্ন ছিল, তুমি অপরের শক্তি চুরি করেছ। দেবীর উত্তর ছিল, তুমি অন্য রূপে যাঁদের দেখছ—সবই আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, আমি বহু হয়েও এক ও অভিন্না। বোঝা যায়, আর্যীকরণের ফলে শক্তিদেবীতে নানা প্রলেপ বা তত্ত্ব সংযুক্ত হলেও অনার্য ভাবধারা তা থেকে মুছে যায়নি। আর্যদের চোখে অনার্যরা ছিল অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণীর, বলা হত অসুর। অথচ অনার্যদের কালী বা শ্যামাই আদি শক্তিমাতারূপে অঞ্চলভেদে ভক্তি-অর্ঘ্য পেতেন, তিনি কালশক্তি ভুবনেশ্বরী। তিনি সবকিছুর আদি, তাঁর মূল বা আদি নেই। ব্যাধ, চণ্ডাল প্রভৃতি যে কালীশক্তির পূজক ছিলেন, সে প্রমাণ খিল হরিবংশে মেলে। মদ ও মাংসই ছিল এ দেবীর মূল নৈবেদ্য। দেবীর নগ্নারূপ বলে দেয়, এ পূজা বহু প্রাচীনকালের। এ পূজায় জড়িয়ে আছে প্রাচীনকালের সংস্কার, বিশ্বাস ও আচার। দেবীর প্রাচীনতার প্রমাণ মেলে কৌশিকী, কাত্যায়নী, পর্ণশবরী নামগুলি থেকেও। প্রাচীন আরণ্যক জাতি কাত্যদের পূজিত দেবীই কাত্যায়িনী, প্রাচীন আরণ্যক জনগোষ্ঠী কুশিকদের আরাধ্যা দেবী কৌশিকী। আবার আদিম শবর জাতির শক্তিস্বরূপিণী মাতৃদেবীই পর্ণশবরী। তিনি এক হয়েও অনেক, অথচ অদ্বিতীয়া।

সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া দক্ষের কন্যা হয়ে জন্মান, তিনি সতী—সর্বার্থেই সততার প্রতীক। স্বয়ংবর সভায় তিনি দেবাদিদেব শিবকেই পতি হিসাবে মেনে নিয়ে শিবসহ কৈলাসবাসিনী হলেন। সতী যেতে চান পিতা দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে। সতীকে শিব ভাবলেন সামান্য নারী হিসাবে। বললেন, শিবনিন্দা শুনতে হতে পারে। কিন্তু সতী যে সাধারণ রমণী নন, তা বোঝাতে শিবের চেতনা ফেরাতে ধারণ করলেন ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির রূপ। ভয়ে শিব কোন্ দিকে ছুটবেন? যেদিকেই পালাতে যান, সামনে সতীশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সতী বললেন, তোমার ভুল ভাঙাতে তোমার সামনে আমি কালী (দক্ষিণা), বামে ভুবনেশ্বরী, ঊর্ধে তারা, পেছনে বগলা, অগ্নিকোণে ধূমাবতী, বায়ুকোণে মাতঙ্গী, নৈর্ঋতে কমলা, ঈশানে ষোড়শী, তোমার সঙ্গে কথা বলছি নিচে ভৈরবী, দক্ষিণে অবস্থান ছিন্নমস্তা রূপ নিয়ে। চামুণ্ডাতন্ত্রে :

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধ বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

দশমহাবিদ্যার রূপ দেখে সতীকে শিব বললেন, তুমি যা ইচ্ছা কর তাই হোক। অন্যান্য মূর্তি অন্তর্হিতা হলে নন্দীকে নিয়ে সতী চললেন দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে। শাস্ত্রে দশমহাবিদ্যার ধ্যানরূপের বর্ণনা মেলে। **কালী** নগ্না, কৃষ্ণবর্ণা, চার বাহুযুক্তা, মুক্তকেশা, নরমুণ্ডমালায় বিভূষিতা, বামে নিচের হাতে নরমুণ্ড, উপর হাতে খড়্গ, ডাইনে নিচের হাত অভয়মুদ্রায়, উপর হাত বরমুদ্রায়, শিরোপরি দাঁড়ানো। **তারা** নীলবর্ণা, করালবদনা, ত্রিনয়নী, বাঘছাল পরা, লম্বোদরী, চতুর্ভুজা, নরমুণ্ডমালায় শোভিতা, খর্বা, শবোপরি দণ্ডায়মানা। **ষোড়শী** চতুর্ভুজা, হাস্যময়ী, ত্রিনয়নী, অপরূপা, চার হাতে বাণ-ধনুক-অঙ্কুশ ও পাশ। **ভুবনেশ্বরী** ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, হাস্যময়ী, মুকুটমণিচন্দ্র, দেহকান্তি নবোদিত সূর্যের ন্যায়, পয়োধর উন্নত। **ভৈরবী** মুণ্ডমালিনী, পদ্মাসনা, ললাটে আধখানা চন্দ্র, চতুর্ভুজা, মাথায় মুকুট, চারহাতে পুঁথি-বর-অক্ষমালা ও অভয়মুদ্রা, ত্রিনেত্রা। ষষ্ঠবিদ্যা **ছিন্নমস্তা** ভয়ঙ্করী, নিজ ছিন্ন মাথা বাঁ হাতে, কাটা গলা থেকে তিনটি ধারায় বার হচ্ছে রক্তস্রোত, বামধারা খাচ্ছেন ডাকিনী, ডানধারায় যোগিনী, মাঝের ধারা পানে রত হাতে ধরা নিজমুণ্ড, আকৃতিতে ষোলো বছরের যুবতী, বিবসনা, পিনোন্নত স্তনদ্বয়। সপ্তমবিদ্যা **ধূমাবতী** চঞ্চলা, বয়সের ভারে এক হাত কম্পমানা, কাকধ্বজ রথে আরূঢ়া, অন্য হাতে কুলা, ধোঁয়ার ন্যায় গাত্রবর্ণা, রুষ্টা, কৃশা, ক্ষুধায় বদন বিস্তার করা। **বগলামুখী** (অষ্টম বিদ্যা) দ্বিভুজা, এক হাতে অসুরের জিভ, অন্য হাতে মুগুর ধরা, রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্টা, পীতবর্ণা, মালা পরিহিতা। নবম বিদ্যা **মাতঙ্গী** দেবী সর্ব পাপহরণী, চতুর্ভুজা, শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়নী, বাকসিদ্ধকারিণী, আধখানা চন্দ্রধারিণী। দশম বিদ্যা বা শেষ বিদ্যা হলেন **কমলা**। অন্য নাম মহালক্ষ্মী, ইনি সৌভাগ্যের দেবী, স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, রত্নের মুকুটধারী, চতুর্ভুজা, সুন্দরী ও অপরূপা। প্রতিটি মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন মহাভাবের প্রতীক।

দশমহাবিদ্যার দেবী সকলকে পূজার সময় তাদের ভৈরবকেও পূজা নিবেদন না করলে দেবীশক্তির পূজা সম্পূর্ণ হয় না। প্রত্যেক দেবীরই আলাদা আলাদা ভৈরব আছেন। কেবল ধূমাবতীর কোনও ভৈরব থাকে না, কারণ তিনি বিধবা। মহাকাল কালীর, অক্ষোভ্য তারার, পঞ্চানন শিব ষোড়শীর, ত্রম্বক ভুবনেশ্বরীর, দক্ষিণা মূর্তি ভৈরবীর, কবন্ধ শিব ছিন্নমস্তার, মহারুদ্র বগলার, মাতঙ্গ শিব মাতঙ্গীর এবং বিষ্ণুরূপী সদাশিব কমলার ভৈরব। আবার দেবীর যে একান্নটি পীঠ আছে, প্রত্যেক পীঠস্থানে শিব এক এক নামে দেবীর অঙ্গ পাহারাদার হিসাবে রক্ষা করছেন। সেসব বিভিন্ন স্থানের শিব নানা নাম ধরে আছেন। যেমন— বৈদ্যনাথ, অমর, চক্রপাণি, জগন্নাথ, কপিলাম্বর, খিরখণ্ডক, চন্দ্রনাথ, রুরু, ক্রমদীশ্বর, কপালী, ভীমলোচন ইত্যাদি। আবার একান্ন পীঠের প্রত্যেকটিতে দেবীর আলাদা আলাদা নামও রয়েছে। যেমন, হিংলাজে পড়েছিল সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র, সেখানে তিনি কট্টরী। তেমনি বীরভূমে (ওষ্ঠ) ফুল্লরা, উৎকলে (নাভিদেশ) বিমলা, কালীঘাটে (দক্ষিণ পদাঙ্গুলি) কালী বা কালিকা, কাশ্মীরে (কণ্ঠদেশ) মহামায়া, ত্রিপুরায় (দক্ষিণ পদ) ত্রিপুরাসুন্দরী, নেপালে (জানু) মহামায়া, কামরূপে (যোনিদেশ) কামাখ্যা, বক্রেশ্বরী (মন) মহিষমর্দিনী, যশোহরে

(পাণিপদ্ম) যশোরেশ্বরী, লঙ্কায় (নূপুর) ইন্দ্রাক্ষী, বৈদ্যনাথে (হৃদয়) জয়দুর্গা, প্রয়াগে (হস্তাঙ্গুলি) ললিতা ইত্যাদি নামে তিনি বন্দিতা। দক্ষযজ্ঞে গিয়ে পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর সেই দেহ কাঁধে ধারণ করে শিবের শুরু হয় প্রলয় তাণ্ডব। মেদিনী কেঁপে কেঁপে উঠলেন। তখন নারায়ণকে ধরে বসুন্ধরা এর প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। নারায়ণ এই বিপদে তাঁর সুদর্শনচক্রে সতীদেহ একান্নটি খণ্ডে ছিন্ন করলে তা একান্নটি স্থানে পড়ে পাথর হয়ে যায়। যুক্তিমতে অবাক হবার কারণ নেই, মিশরের মমিগুলিও যে কালের ফেরে আজ পাথর।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দশমহাবিদ্যা' কবিতায় সমাজ-সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারায় মূর্তিগুলির বিজ্ঞানসম্মত ধারায় বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্যই এক্ষেত্রে তাঁর সামনে ছিল হিন্দুর দশাবতারবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। হেমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় সৃষ্টির প্রথম দিকে মানুষ নগ্ন, চারদিকে হানাহানির বাতাবরণ, সে অবস্থার প্রতীক কালী। ধীরে সে অবস্থার অবসানে মানুষ সভ্যতার পথে পা বাড়াচ্ছে, তখন দেবী তারারূপী, তখন তাঁর পরনে বাঘের চামড়া, তখনও তিনি নরমুণ্ডের মালাধারিণী। দাম্পত্য জীবনের প্রেমধর্মের প্রতীকে পাই দেবী ষোড়শীকে। কামিনী থেকে সন্তানবৎসলা জননীরূপ ভুবনেশ্বরীর মধ্যে পাই। সমাজজীবনে ভক্তির হাত ধরে এলেন ভৈরবী। মদ-মাদকতার, কামনা-বাসনার বিচ্ছিন্নকালে আত্মনিবেদনের প্রেক্ষিতে আত্মপ্রকাশ দেবী ছিন্নমস্তার। মানুষ যখন খাদ্যাভাবে হতাশায় কাতর, সে সময়ে এলেন বিধবার রূপে বিবর্ণা ধূমাবতী। দারিদ্র্যকে ঠেকাতে এরপর এলেন বগলাশক্তি। সংহতি ও মিত্রতার দ্যোতক হিসাবে পাই দেবী মাতঙ্গীকে। দুঃখ-কষ্টের পালা শেষ হলে মানুষ যখন সুখে-শান্তিতে কালযাপন করছে, সেই সুদিনের প্রতীক হলেন মাতা কমলা।

কালীর আরও রূপ রয়েছে, কালীর পূজা আগমবাগীশের আগেও ছিল। যেমন— ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, মহাকালী, গুহ্যকালী, রক্ষাকালী, সিদ্ধকালী ইত্যাদি। আসলে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই প্রথম মাতৃকাশক্তির প্রকাশ। কালিকা পুরাণে পাই বিষ্ণুর মায়াশক্তি রূপে সতীকে। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে কালীর যে রূপ আমরা পাই, তা ভয়ঙ্করী রূপ। প্রবাদ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বছরে দশ হাজার পূজা হত দেবী কালিকার। এই কালীর মূর্তির বাম পা আগে বাড়ানো থাকলে তিনি বামা। কিন্তু ডান পা আগে থাকলেই তিনি দক্ষিণা কালী হন, তিনি দয়া-দক্ষিণা প্রদান করেন, সেই অর্থেই তিনি দক্ষিণা কালী। তবে কালীতত্ত্ব জানতে-বুঝতে, কালীর ইতিবৃত্ত অনুধাবন করতে তন্ত্রশাস্ত্রের পাঠ এককথায় অনস্বীকার্য।

কালীর রং কালো। সাত প্রকার রঙের মিলিত রং যে কালো। সবকিছুর পরিণতি সেই মহাকালে, তারই প্রতীক তামসী আদিরূপা কালী। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল দেখায়, কাছে গিয়ে তা হাতে নিলে কোথায় নীল! তেমনি শক্তিদেবী কালী দূর থেকে কালো, কাছের হতে পারলে তাতে কত আলো।—বলে গেছেন রামকৃষ্ণদেব। দেবীর গলায়

পঞ্চাশটি মুণ্ডমালা কেন? আসলে, স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের মোট পঞ্চাশটি বর্ণ ঘিরেই আমাদের যত ভাবনা-চিন্তা, ধ্যানধারণা, ওঠাপড়া ইত্যাদি। এই পঞ্চাশটি বর্ণের আলাদা আলাদা অর্থও করা হয়েছে শাস্ত্রে, সে সব অর্থ আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার সঙ্গেই মিলে যায়। বর্ণগুলিকে আমরা কণ্ঠেই ধরি। পঞ্চাশটি বর্ণমালার প্রতীকীরূপ সেই পঞ্চাশটি নরমুণ্ড। কালীর বাম নিচের হাতে ঝুলছে ভিন্ন এক নরমুণ্ড। মানুষের আপন দেহভাণ্ডেই রয়েছে যে চক্রাধার, তার সংখ্যা নয়। এই চক্রাধার সমূহের অন্যতম চক্রাধার সহস্রার অবস্থান মানুষের মাথায় তালুতে। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানের আধার তো মস্তিষ্কই। সেহেতু মাতৃদেবী ধরে আছেন মাথা, যত চিন্তা-চেতনার রাশ তাঁরই হাতে। কালী যদি শাস্ত্রমতে দিগম্বরীই হবেন, তবে লজ্জা কাটাতে কেনই বা এল নরহস্তের অমন কটিবাস। আসলে, হাতছাড়া যে কোনও কাজই হয় না। কর্মানুসারে ফলপ্রাপ্তি ঘটে। প্রলয়ে সবই শেষ হয়ে যায়। যেমন কর্ম তেমন ফল দেবার জন্য কর্মের প্রতীক হাতগুলিকে মাতা কালী কটিদেশে যত্নে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন। মহাকাল কেবল কর্মটাই দেখবে। মঙ্গলময়ী কালীর দুই কানে দুই শিশুর শব কেন? শিশুর ন্যায় সরল তত্ত্বজ্ঞ নির্বিকার সাধকই কালীর একান্ত প্রিয়। সন্তান জন্মেই ওঁমা সুরে কাঁদে, তা থেকে ব্রহ্মনাদ ওঁম শুনতেই মা কালীর দুই কানে দোল খাচ্ছে সহজ ও সত্যের প্রতীক শান্ত দুই শিশুরূপ অলঙ্কার। ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের প্রতীকে সাধারণভাবে কালী মহামায়ার চারটি হাত। কালীর ডানদিকের ওপরের হাত অভয়মুদ্রায়, বিপদে তিনি জীবের অভয় দান করেন। শাস্ত্রে তিনিই যে বিশ্বজননী। তাঁর বামদিকের ওপরের হাতে খড়্গ, কামনা-বাসনা-লোভ-লালসারূপ অসুরকে তিনি নিধন করে জীবকুলকে জীবনের পবিত্র, সঠিক ও সত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন। জীবের আসুরিক শক্তির তিনি বিনাশিকা। মায়ের ডান নিচের হাতে থাকে পদ্ম। কৃপাপ্রার্থী সাধক-ভক্তের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে মা তার জীবনকে শতদলে বিকশিত করবেন, এমনই তা ভাবের দ্যোতক। মা কালীর অসংযত জিহ্বা চাপা থাকে সারিবদ্ধ সাদা দাঁতে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আর ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র জিহ্বাই একাধিক কাজে সমর্থ। জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা কথা বলার কাজও হয়। জিহ্বা সাধুকে চোর বানায়, চোরকে সাধু। সাধককে বিপথগামী করে, মনুষ্যত্বকে নরকে নামায়। দাঁত হল সংযম বা ব্রহ্মচর্যের প্রতীক। সংযমী দাঁত দিয়ে জিহ্বাকে শাসন করা হচ্ছে। অর্থাৎ বাক্য বা কথাকে সংযত করা। এই শিক্ষাই এখানে মেলে। উল্লেখ্য, চোখ দিয়ে শোনার কাজ হয় না, তেমনি কান দিয়ে দেখাও যায় না—যার যা কাজ কেবল সে কাজই হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম জিহ্বা। মা এলোচুলে কেন? মা অবিলাসী, গতির প্রতীক তাঁর এলোকেশ। তিনি জীবকে বাঁধেন, আবার মুক্তও করেন, তাই তিনি মুক্তকেশী, এলোকেশী। কেন তিনি দিগম্বরী? দশটি দিকই তাঁর পরিচ্ছদ, আলাদা পোষাক আবার কেন? তিনি সর্বব্যাপী মহাশক্তি, কোনও বন্ধনই যে তাঁর নেই। মা কালী ত্রিনয়নী, তাঁর তিনটি চোখ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের প্রতীক, তা দিয়ে তিনি অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখেন। মাতা কালী শবসদৃশ শিবোপরি

দাঁড়িয়ে আছেন। শিব এখানে শবাকার নিষ্ক্রিয় পুরুষের প্রতীক। পরন্তু, প্রকৃতি বা শক্তির বশীভূত। আর মা কালী হলেন নিত্য লীলাময়ী। শক্তিমাতার পদতলে শুয়ে আছেন শিব, তিনি শক্তিমাতার অধীন। শক্তিমাতার শক্তি নিয়েই শিব শক্তিমান। তাই শক্তির পদতলে নিশ্চল শুয়ে থেকেই তিনি ঊর্ধমুখী, শক্তিপ্রার্থী।

শক্তিদেবীর কাছে মানত করে, তাঁর কৃপায় অনেকেই সন্তান লাভ করে থাকেন। সেই বিশ্বাস ও ভক্তিতে আমাদের সমাজে অনেকেরই হয়ে থাকে কালিদাস, কালীপদ, কালীকৃষ্ণ, কালীচরণ, কালীপ্রসাদ, শ্যামাকান্ত, কালীশংকর, কালীপ্রসন্ন কিংবা কালীকুমার, কালীকিংকর ইত্যাদি নাম। এক্ষণে, সবকিছু মিলে তাই কালীকে প্রণাম।